

উম্মাহ'র নেতাদের প্রয়োজনীয় গুণাবলীঃ ইলম

ইসমাঈল বিন আব্দুর রহিম

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

‘আর বল, হে প্রভু! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।’

ইলম: আভিধানিক অর্থ জানা। যেমন: বলা হয়: يَعْلَمُهُ عِلْمًا (সে বিষয়টি ইলম অর্জন করেছে বা করবে)। অর্থাৎ সে জেনেছে বা জানবে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: ‘কোন জিনিসের প্রকৃত তত্ত্ব জানা’। কেউ বলেছেন, ‘জ্ঞাত জিনিসের ব্যাপারে অস্পষ্টতা দূর করা’। আর জাহল বা অজ্ঞতা হলো তার বিপরীত। কেউ বলে, এর কোনো সংজ্ঞার প্রয়োজন নেই। কেউ বলে, ‘ইলম এমন একটি প্রশংসিত গুণ, যার দ্বারা সামগ্রিক ও একক বিষয়সমূহ উপলব্ধি করা যায়’।

আমরা সেই ইলমের আলোচনা দিয়ে শুরু করবো, যে ইলমের আলোচনা দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা তার নবী (সা.) এর সঙ্গে কথা শুরু করেছেন:

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

‘পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’ (আলাক: ১)

অন্য আয়াতে বলেছেন:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

‘তাই জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আর নিজের গুনাহর জন্য এবং মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ তোমার গতিবিধি ও অবস্থানস্থল সম্পর্কে জানেন।’ (মুহাম্মদ: ১৯)

হাসান ইবনে ফজল রাহি. বলেন: ‘তাই তোমার ইলমের ওপর আরও ইলম বৃদ্ধি কর’। আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহীর শুরুই হলো ইলম দিয়ে। ইলম হচ্ছে একটি নূর, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। যাতে তাদের জীবন তাঁর সন্তুষ্টিমত পরিচালিত হয়। মানুষের ইলম যত বৃদ্ধি পায়,

আপন রবের প্রতি, নিজ আত্মার প্রতি এবং স্বীয় দাওয়াত সঠিক ও হক হওয়ার প্রতি তার আস্থা ও বিশ্বাস তত বৃদ্ধি পায় এবং উক্ত দাওয়াত বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ়তার সাথে পথ চলার হিম্মতও বৃদ্ধি পায়। যেন সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণ বান্দার নিকট আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছে যায়। ইলম যদি ব্যাপকভাবে সবার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গুণ বলে গণ্য নাও হয়, তথাপি একজন মুসলিম নেতার জন্য অত্যাবশ্যকীয় গুণগুলোর মধ্যে ইলম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ওটা অন্যান্য গুণগুলোর সাথেও জড়িত। কেননা কিছু গুণ রয়েছে, যেগুলো ইলম ছাড়া অস্তিত্বেই আসতে পারে না যেমন সহনশীলতা। ওটা ইলমের সাথে পরিমিত হওয়া অনিবার্য। এমনিভাবে দৃঢ়তা ও বীরত্বের গুণদ্বয়ও। এমনিভাবে প্রতিটি গুণই কোনো না কোনোভাবে ইলমের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং ইলম হলো সকল গুণগুলোর উৎস ও ভিত্তি।

একজন নেতা এক মুহূর্তের জন্যও এ গুণটি হতে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে যে স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন এবং যে গুরুদায়িত্ব তাকে দিয়েছেন, সে দায়িত্বের জন্য যতটুকু ইলম প্রয়োজন, ততটুকু ইলম অর্জন করা তার ওপর ফরজ। আর এই ইলম অর্জন করা হবে আল্লাহর কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস থেকে। এবং সবশেষে সঠিক উৎস হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাচার অনুসন্ধানের মাধ্যমে। তাছাড়া বিভিন্ন ঘটনায় রাসূল (সা.) বা সাহাবীদের আমল সম্পর্কে অবগত হওয়া, তাতে চিন্তা করা, অতঃপর আমাদের জামানায় তার অনুরূপ ঘটনাবলীকে তার সাথে কiyাস করার মাধ্যমেও সমাধান লাভ করা যায়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কারণ ইলমের বিষয়টি আরও ব্যাপক। শুধু এগুলোর ওপরই স্ফাক্ত থাকা সঠিক নয়।

কারণ অনেক সময় আমাদের জামানায় এমন বিষয় সংঘটিত হয়, যার অনুরূপ ঘটনার ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) বা সাহাবাগণের অবস্থান দেখলে মনে হয়, আমাদের জামানায় এর থেকে ভিন্নটা উত্তম। স্পষ্ট করার জন্য বলি: কখনো কোনো লোক কোনো একটি ঘটনায় কঠোর আচরণ অবলম্বন করার পক্ষে রাসূল (সা.) এর এমন একটি ঘটনা দিয়ে দলিল দিল, যাতে রাসূল (সা.) কঠোর আচরণ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু লোকটি উক্ত ঘটনার সময় বোঝেনি। কারণ রাসূল (সা.) কঠোর আচরণ অবলম্বন করেছিলেন মদীনায় হিজরতের পরে। পক্ষান্তরে মক্কায় থাকাকালীন এমন ঘটনার ক্ষেত্রে ‘ক্ষমা ও মার্জনা’ই ছিল তার একমাত্র কথা। এবং সাহাবায়ে কেরামকেও এরই আদেশ দিতেন। আর উক্ত হুকুমটি আমাদের বর্তমান জামানায় আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কারো নিকট অস্পষ্ট নয় যে, বর্তমানে শাসন ও ক্ষমতা অমুসলিমদের হাতে। যা একটি সীমা পর্যন্ত রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের মক্কার অবস্থার সাথে সাদৃশ্য রাখে।

রাসূল (সা.) এর সময় অন্যায়কে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করতেন না। আমি যা জানি, তাতে এরকম কোনো ঘটনা নেই যে, রাসূল (সা.) যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোনো কাফিরকে হত্যা করেছেন বা শাস্তি দিয়েছেন। যাই হোক, মক্কী জীবনে রাসূল (সা.) শুধু আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন আর ক্ষমা করে যেতেন। অর্থাৎ সে সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর একমাত্র কাজ ছিল তার রবের দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া, যেহেতু তখন মুসলিমগণ ছিলেন দুর্বল। যাতে কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ দলিল পেয়ে যায় এবং পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে তাদের নিকট অপছন্দনীয় বিষয়গুলো দেখলে তার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে না পড়ে। অর্থাৎ তাদের অহংকার ও জুলুমের কারণে যেগুলোকে অপছন্দ করে। আমাদের বর্তমান অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। কেননা বর্তমানে এমন অনেক অমুসলিম রয়েছে, যাদের ইসলামের ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই, চাই পাশ্চাত্যের হোক বা আমাদের সমাজের

খৃষ্টানরাই হোক। এমনকি অনেক মুসলিমও এমন রয়েছে। এক্ষেত্রে ইসলামের বিশুদ্ধ নিদর্শনগুলো থেকে যে যত দূরে, তার অজ্ঞতার পরিমাণও সে স্তরের।

একারণে এখন যদি ‘নাহি আনিল মুনকার’ করতেই হয়, তাহলে নম্রতা থেকে ধাপে ধাপে কঠোরতার দিকে যেতে হবে। অতঃপর এই নম্রতার কথা সমস্ত সৃষ্টির কর্ণকুহরে ও চোখের সামনে এমনভাবে পৌঁছে দিতে হবে, যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মক্কায় মানুষকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তখন নিকট-দূরের প্রত্যেক গোত্রই মুশরিকদের প্রতি রাসূল (সা.) এর ক্ষমা ও মার্জনার বিষয়ে ব্যাপকভাবে জেনে গিয়েছিল। কিন্তু এর বিপরীত করলে এই দ্বীনকে বিকৃতভাবে চিত্রায়িত করা হবে। যা বর্তমানে হয়েছে। ‘সন্ত্রাস ও কটরপন্থী’ তকমা গায়ে লেগেছে। এমনকি যখনই তাদের আলোচনা সামনে আসে, তখনই এই চিত্রটি ভেসে ওঠে। আর এটা শুধু সেই অজ্ঞতার কারণে, যা নিজেদেরকে উম্মাহর নেতৃত্বদানের অধিকারী দাবিদার—কিছু লোককে এমন কাজে লিপ্ত করিয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহর দ্বীন ও তার শরীয়ত বাস্তবায়নের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ করে দিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এ বিষয়টাকে উপদেশ গ্রহণের দৃষ্টিতে দেখা উচিত।

কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) হুদূদ কায়েম করা ও হত্যাযোগ্য লোকদেরকে হত্যা করার কাজ তখনই শুরু করেছেন, যখন কাফিররা ও অন্যরা সবাই এই দ্বীনের ব্যাপারে পূর্ণ দলিল পেয়ে গিয়েছিল। এমনকি তারা একথাও জেনে গিয়েছিল যে, রাসূল (সা.) এর দয়া, তার কঠোরতার ওপর প্রবল এবং তার নিকট কঠোরতা থেকে দয়া ও করুণাই অধিক প্রিয়। ফলে তিনি যখন মদীনায় কঠোরতার আচরণ গ্রহণ করলেন, তখন কাফিরদের কোনো ছোট প্রমাণই অবশিষ্ট রইল না। এমন পরিবেশ তিনি একদিন বা এক রাতে প্রস্তুত করেননি।

ইমাম সারাখসি রাহি. বলেন: জিহাদ ও কিতালের আদেশ পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথমে শুধু রিসালাত পৌঁছানো আর কাফিরদেরকে এড়িয়ে চলতে আদিষ্ট ছিলেন। তারপরে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করার আদেশ পান। তারপরে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। তারপরে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়, যদি কাফিরদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা হয়। তারপরে তাদেরকে হারাম মাসসমূহ অতিক্রম করার শর্তে কিতালের আদেশ দেওয়া হয়। তারপরে ব্যাপকভাবে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়। আমি এ বিষয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করলাম। কারণ, আপনারা জেনেছেন, আমাদের দেশগুলোতে এমন কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে, যেগুলোকে ইসলামী মনে করা হয়, অথচ ইসলাম এগুলো থেকে মুক্ত। একারণেই মুসলিম নেতৃত্বের ওপর আবশ্যিক ছিল সর্বদা ইলম অর্জনের চেষ্টা করা এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নির্ভরযোগ্য, হিদায়াতপ্রাপ্ত ও সত্যবাদী আলিমদের থেকে পরামর্শ নেওয়া। যেন উম্মাহকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারেন, বিভ্রান্তির গোলকধাঁধা থেকে স্পষ্ট সত্যের আলোতে নিয়ে আসতে পারেন। তাছাড়া তাঁর এরূপ দলিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে, যার দ্বারা তিনি তাঁর বিরুদ্ধবাদী বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে পারেন।

এমনিভাবে তাঁর কর্তব্য হবে, প্রজাদেরকে ইলম অর্জনে উৎসাহিত করা, এর জন্য অনেক ইলমি মারকায ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলা... ইত্যাদি। আর শাসক নিজেই তালিবুল ইলমদের ব্যয়ভার বহন করা, তাদের জন্য নিয়মতান্ত্রিক ভাতা নির্ধারণ করা, যা তাদেরকে প্রাত্যহিক জীবনে সহযোগিতা করবে, আলিমদেরকে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী মূল্যায়ন করা, তালিমে নিয়োজিতদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা, বহির্বিশ্ব থেকে আলিমদেরকে আমন্ত্রণ জানানো ইত্যাদি তার অত্যাৱশ্যকীয় দায়িত্ব। যেন এর মাধ্যমে ইলম প্রসার লাভ করে এবং মুসলিম শহরগুলো ইলমের সৌরভে সুরভিত হয়, উন্নতি লাভ করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও তার

রাসূল (সা.) মুসলিমদেরকে ইলম অন্বেষণ করতে ও আলেমদের অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

‘মুসলিমদের পক্ষে এটাও সমীচীন নয় যে, তারা (সর্বদা) সকলে এক সঙ্গে (জিহাদে) বেরিয়ে যাবে। একটি অংশ কেন বেরিয়ে যায় না, যাতে (যারা জিহাদে যায় না) তারা দ্বীনের উপলব্ধি অর্জনের চেষ্টা করে এবং সতর্ক করে তাদের কওম (সেই লোক)-কে, যারা জিহাদে গিয়েছে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে, ফলে তারা (গুনাহ থেকে) সতর্ক থাকবে।’ (তাওবা: ১২২)

আবুদদারদা (রা.) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যে ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে পথ চলে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আর ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীদের জন্য তাদের ডানাগুলো বিছিয়ে দেন। আলেমের জন্য আকাশ ও যমীনের অধিবাসীরা- এমনকি সমুদ্রের মাছও ক্ষমা প্রার্থনা করে। আবিদের ওপর আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব হলো, তারকারাজির ওপর চন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায়। নিশ্চয়ই নবীগণ দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকার বানিয়ে যান না; বরং তারা ইলমের উত্তরাধিকার বানান। তাই যে তা গ্রহণ করল, সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করল।" (বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযি)

মুআবিয়া (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "আল্লাহ যার ব্যাপারে কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন।" (বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি ও মুসলিম)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহি. বলেন: "এটা প্রমাণ করে, যাকে তিনি দ্বীনের ফিকহ বা বুঝ দান করেননি, তার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেননি। আর যাকে দ্বীনের বুঝ দান করেছেন, তার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেছেন। তবে এখানে ফিকহ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে এমন ইলম, যার অনিবার্য ফল হচ্ছে আমল। কিন্তু যদি তার দ্বারা নিছক ইলম উদ্দেশ্য হয়, তখন এটা একথা প্রমাণ করবে না যে, যে দ্বীন বুঝ অর্জন করেছে, তার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করা হয়েছে। কারণ তখন কল্যাণের ইচ্ছা করার জন্য দ্বীন বুঝ থাকা হবে শর্ত। আর প্রথমাত্মক অবস্থায় তা হবে ফল। আল্লাহই ভালো জানেন।"

ইবনে বাত্তাল রাহি. বলেন: "এর মধ্যে সকল মানুষের ওপর আলিমদের শ্রেষ্ঠ হওয়ার এবং অন্য সকল ইলমের ওপর দ্বীন ফিকহ শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। আর এর শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ হলো, যেহেতু এটা আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করতে, তাঁর আনুগত্যে অটল থাকতে ও তাঁর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। তাই ইলমের দ্বারাই সমস্ত ইবাদত বিশুদ্ধ ও উপযুক্ত হয়, আর তা না হলে প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী ত্রুটি হতে থাকে। এমনকি কখনো তা গুনাহয় পরিণত হয়। ইলমের দ্বারাই জাতি উন্নতি লাভ করে আর ইলম ছাড়া পতিত হয়। আর উম্মাহর নেতৃবৃন্দই উক্ত ইলমের সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদিসে এমনটিই বর্ণনা করেছেন, যা বর্ণনা করেছেন হযরত আবুদদারদা (রা.), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আলিমগণ নবীদের ওয়ারিশ। আর নিশ্চয়ই নবীগণ দিনার বা দিরহামের উত্তরাধিকার বানিয়ে যান না। বরং তারা ইলমের উত্তরাধিকার বানান। তাই যে তা গ্রহণ করল, সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করল।"

ইলম অর্জন শুধু শারঈ ইলম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটা যেকোনো কারিগরি, প্রযুক্তিগত, সামরিক এবং অন্যান্য ইলমকেও

অন্তর্ভুক্ত করে। আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "ইলম অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ।" (বর্ণনা করেছেন ইমাম বায়হাকি রহ, শায়খ আলবানি তার 'সহীহুল জামে' কিতাবে এর বিশ্বস্ততা বর্ণনা করেছেন)

ইমাম বাইহাকি রাহি. বলেন: "উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন ইলম, যা কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির অজানা থাকার অবকাশ নেই। অথবা এমন জিনিসের ইলম, যা শুধু তার সামনে উপস্থিত হয়।"

সে এটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে। অথবা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ লোক এই দায়িত্ব পালন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ। আল্লাহই ভালো জানেন।" ইলম ও আলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হলো: তাদের একজন আবিদ (শুধু ইবাদতকারী), অপরজন (ইবাদতকারী) আলিম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, "আবিদের ওপর আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব হলো তোমাদের সবচেয়ে নিম্নস্তরের লোকের ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায়।" অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আসমান ও যমীনবাসীরা এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যে মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দেয়।"

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রাহি.) বলেন: "যেহেতু তাঁর প্রদত্ত শিক্ষাই তাদের মুক্তি, সৌভাগ্য ও আত্মশুদ্ধির কারণ হবে, একারণেই আল্লাহ তা'আলা তাকেও অনুরূপ আমলের সাওয়াব দেবেন। আর তা এভাবে যে— তিনি তাঁর সালাত, ফেরেশতাদের সালাত ও যমীনবাসীদের সালাত থেকে একটি অংশ তার জন্য নির্ধারণ করবেন, যা তার মুক্তি, সৌভাগ্য ও সফলতার কারণ হবে। কারণ যেমনভাবে মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দাতা আল্লাহর দীন ও তাঁর বিধি-বিধানকে প্রকাশকারী এবং মানুষের নিকট আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর পরিচয় দানকারী, অনুরূপ আল্লাহ তা'আলাও নিজের সালাত, আসমানবাসীদের সালাত ও যমীনবাসীদের সালাত তার জন্য নিয়োজিত করবেন, যার ফলে আসমান ও যমীনবাসীদের মাঝে তার প্রশংসা, সম্মান ও স্তুতি গাওয়া হবে।"

ইমাম বদরুদ্দীন ইবনে জামাআহ (রাহি.) বলেন: "জেনে রাখুন! ঐ ব্যক্তির মর্যাদার চেয়ে উঁচু মর্যাদা কিছু হতে পারে না, যার জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনায় ফেরেশতাগণ ও অন্যান্য মাখলুকগণ নিয়োজিত হন এবং তার জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন।" একজন নেককার ব্যক্তি বা যার ব্যাপারে সালেহ হওয়ার ধারণা করা হয়, তার থেকে দু'আ নেওয়ার ব্যাপারেই মানুষ প্রতিযোগিতা করে, তাহলে ফেরেশতাদের দু'আর বিষয়টি কত মর্যাদাপূর্ণ! ফেরেশতাদের ডানা বিছানোর অর্থ কী? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ হলো, তার জন্য বিনয়ী হওয়া। কেউ বলেছেন, তার নিকট আসা ও তার সাথে উপস্থিত হওয়া। কেউ বলেছেন, তাকে সম্মান করা। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো, ফেরেশতাগণ তাকে ডানার ওপর বহন করে, অতঃপর তাকে গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। আর পশুপাখিকে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার বুঝ দেওয়ার কারণ হিসেবে কেউ কেউ বলেছেন: প্রথমত: যেহেতু এগুলোকে সৃষ্টিই করা হয়েছে মানুষের কল্যাণ ও সুবিধার জন্য। তাছাড়া আলিমগণই এগুলোর মধ্যে কোনটি হালাল, কোনটি হারাম, তা বর্ণনা করেন এবং এদের প্রতি দয়া করার ও এদের ক্ষতি না করার উপদেশ দেন।